যা মনে পড়ে

অরণি মুখোপাধ্যায়

১৯৭৪ কি ১৯৭৫ সালের কথা। তখন আমি কর্মরত। যতদূর মনে পড়ে কোনো এক রবিবার বিকালে আমার নমাসীমার ছেলে অর্থাৎ আমার স্নেহের মাসতুতো ভাই কল্যানীয় সুহাস আমাদের বাড়ীতে হঠাৎই উপস্থিত হল। বিনা ভূমিকায় আমায় বলল - আমাদের আশ্রমের এই পত্রিকাটি নিয়ে এলাম। আশাকরি তুমি এর গ্রাহক হবে। পত্রিকাটি আমি নিলাম ও তার গ্রাহক হবার প্রতিশ্রুতিও দিলাম। সামান্য গ্রাহক মূল্য গ্রহণ করে সে আমায় একটা মহৎ যোগাযোগের সেতুবন্ধন সেই মুহূর্তে ঘটাল। আমি জানতে চাইলাম আশ্রমটি কোথায় এবং এই আশ্রমের নাম কি? সে এবার বল্‌লে — তোমাদের বাড়ীর কাছে রাণী শঙ্করী লেনে এই আশ্রমটির নাম "বিজ্ঞানানন্দ মিশন"। স্বামী শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী এই " মিশন" টির প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তাঁরই পতাকাবাহী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী লেনিন রায় আমাদের পথ প্রদর্শক। এই বলে সে আমায় আরো বল্‌লে শনিবার বিকালে বা রবিবার বিকালে গেলে তুমি আমায় ও আরো কিছু ভক্ত ও অনুরাগীর দেখা পাবে। "তুমি নিশ্চয়ই একদিন এসো"। তার বলায় এমন একটি আন্তরিক স্পর্শ ছিল যে আমি সেই আকর্ষণে এক রবিবার বিকালে ভবানীপুর থানার প্রায় পাশের রাস্তাটি দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটি ছোট মাঠের বিপরীতে যে বাড়ীটির Letter Box এ বাড়ীটির পরিচয় লেখা আছে সেই বাড়ীতে পৌঁছলাম। কংক্রিটের বন্ধনের মধ্যে এটা এক ব্যতিক্রম। এখানে এমন একজন মহাপুরুষ এক সময়ে বসবাস করেছেন যিনি জড়ের মধ্যে চেতনের সঞ্চার করে গেছেন মানুষের হৃদয়ে। রেখে গেছেন তাঁর প্রিয়তম উত্তর সাধক ও মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যানের সাধক পরম পুজনীয় শ্রী শ্রী লেনিন রায়। আমি সামনের দরজা দিয়ে এই বাড়িতে প্রবেশ করে ডানদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল আমার ভাই একটি রকে বসে আছে। "শালপ্রাংশু মহাভুজ" বলতে যা বোঝায় তা না হলেও তার চেহারা ছিল বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। (তার সম্মন্ধে আমাকে খুব সাবধানে শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে কারণ তাঁর পত্নি একজন আইনজ্ঞ, কাজেই একটু - এদিক ওদিক হলে হয়ত বা কোর্টের নোটিশ ধরিয়ে দিতে পারেন যদিও তার সম্ভাবনা কম) দেখলাম সে শান্ত ভাবে সেই বেদীতে বসে আছে। মুখে তার সুস্মিত হাসি। সবচেয়ে বড় কথা সেই নিশ্ছিদ্র জমাট কংক্রিটের উপর (যতদূর মনে হয় জায়গাটি তখনো পাথরে বাঁধানো হয়নি) একটি ছোট প্রাণবন্ত ডুমুর গাছ। অর্থাৎ বলা যেতে পারে "জড়" কে বশীভূত করে জীবনের জয়ধ্বজা। যিনি বহু আর্ত ও জিজ্ঞাসুর জীবনে দিশা দেখিয়েছেন তাঁর আশ্রমে "জড়" শুদ্ধ হয়ে "জীবনের" বহিঃ প্রকাশ স্বাভাবিক। আজ লিখতে বসে মনে হল স্বামী শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী একজন নিপুন ভাস্কর। তাঁর সবচেয়ে নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির নাম মহাত্মা শ্রী শ্রী লেনিন রায়। তাঁর সার্থক পতাকা বাহক। যিনি স্বামীজি দেহাতীত হওয়ার পরে তাঁর মানব কল্যানের পতাকাটি আজীবন বহন করে গেছেন।

যা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তারপর থেকে প্রায় প্রতি শনিবার আর রবিবার বিকালে আমি ভাইয়ের কাছে বিজ্ঞানানন্দ মিশনে যেতাম। কখনও কখনও সৌভাগ্য হলে মহাত্মা লেনিন রায়েরও দর্শন লাভ হত। তখনও আশ্রমের পরিসর বড় হয়নি। ভেতরের ঘরের চেয়ারটিতে উনি বসতেন। কোন ভক্ত হয়ত বসে তাঁর আগমন সংবাদ নিয়ে আমাকে দিতেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতাম। তিনি সুস্মিত মুখে আমায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন। কথা উনি কম বলতেন। বরাবরই দেখেছি একটি সহজাত গাম্ভীর্য তাঁর ছিল। একবার যখন আমি ভাই'র সঙ্গে বাইরের খোলা উঠানে বাঁধানো জায়গাটিতে যেখানে ভাই বরাবর বসত, আমি তার অনতীদূরে কথা বলছি এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে কথার শব্দ পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম উনি কি এসেছেন? ভাই সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানালেন হ্যাঁ। এরপর আমি কিছুক্ষণ কথা বলে আশ্রম থেকে বিদায় নিলাম। তার পরের রবিবার দেখি তিনি এসেছেন। আমি সুহাস কে বলে ভেতরের ঘরে গিয়ে মহাত্মা লেলিন রায়কে যথারীতি আমার শ্রদ্ধা জানালাম, উনি পূর্বের মতই আমার বললেন যে তিনি ভাল আছেন। এরপর আবার ভাইয়ের কাছে ফিরে এলাম, ভাই শান্ত গম্ভীর স্বরে আমায় বল্লে ঃ- তুমি যদি আজও তাঁর সঙ্গে না দেখা করতে তাহলে আমি তোমায় এখানে আসতে বারণ করতাম। সেদিন আমি ওনাকে বলেছিলাম "তুমি এলে অথচ অরণিদা তোমার কাছে গেল না, এরপর আমি ওকে এখানে আসতে বারণ করব"। "উনি বললেন তোমার দাদা তোমাকে ভালবাসে তো"? এই কথা বলে আমাকে শান্ত করলেন। যাক আমি কিছু না বললেও তুমি যে আজ গিয়েছিলে তাতে ভালই হল। নচেৎ আমি তোমায় এখানে আসতে বারণ করতাম। সেদিন তাঁর specific and positive attitude -র জন্যে আমি আজও তার গুরুগত প্রাণ মন্তব্যটিকে যথাযোগ্য সম্মান জানাই। এরপরে আমায় সুহাস একদিন বললে, "চল আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে"। আশ্রম বন্ধ করে সে আমায় নিয়ে মোড়ের মাথায় এসে একটি ট্যাক্সিতে উঠে বেকবাগানে এল। এরপর একটি বড় বাড়ী যা দেখেই মনে হয় সবে তৈয়ারী হয়েছে তার যতদূর মনে পড়ে দোতলাম একটি অ্যাপার্ট্মেন্টে আমায় নিয়ে ঢুকল। সামনেই কাঠের পার্টিশান তার ওদিকে একটি টেবিল ও দুদিকে চেয়ার সেখানে গিয়ে সুহাসের শ্রী গুরুদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁর উল্টোদিকের চেয়ারে এক ভদ্রলোক চুপচাপ শান্ত ভাবে বসে আছেন। আমরা কিছুক্ষণ রইলাম দেখলাম তখনও তিনি ধ্যানমগ্ন - একদম স্থির। এবার আমরা দুই-ভাই নীরবে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এসে সুহাস আমায় বলল, "যে ভদ্রলোক বসেছিলেন ভেতরে বসেছিলেন ও কে জান"? আমি মাথা নাড়লাম। এবার ভাই বলল, "ওনার নাম "জনক লাল" উনি কালিপদ গুহ রায়ের শিষ্য। ঠাকুর আমায় বলেছেন উনিও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক অগ্রসর হয়েছেন"। ও আরো বললে "ঠাকুর বললেন - লাল সাহেবের মত মানুষ তোমাদের ভবানীপুরেও নেই।" আমি যথাচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সুহাসের মন্তব্য শুনলাম। একটা কথা এখানে বলিঃ- সুহাস কখনও কোন কথা অতিরঞ্জিত করত না। যা যথার্থ শুধু পক্ষপাত শুন্য হয়ে সেই কথাটাই বলত। সেজন্যে বরাবরই আমি তার কথাকে দাম দিয়েছি। সেইদিন থেকে ঠাকুর লেনিন রায় সম্পর্কে আমার ধারনা পাল্টে গেল। যিনি এত গভীর ধ্যানে এতদীর্ঘ সময় মগ্ন থাকেন বাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থা

যে কতদূর উন্নত তা আমার মত অভাজন কি বুঝবে? এরপরে আমার কোন আইনগত কাজে একদিন লেবার কোর্টে আমার আইনজ্ঞের সাথে দেখা করতে গেছি। আইনজ্ঞরা যে ঘরে বসেন তার বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার আইনজ্ঞ এসেছেন কিনা দেখছি এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা আমায় এসে বললেন "উনি আপনাকে ডাকছেন"। আমি ঘরের ভিতর গিয়ে দেখলাম শ্রদ্ধেয় শ্রী রায় একটি চেয়ারে বসে আছেন। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্য মুখে বললেন - "আমি একে বললাম ছেলেটিকে ডেকে আনত? নিজের লোক বাইরে কেন?" কথাটা বিদ্যুৎ চমকের মত আমার শরীরে শিহরণ জাগাল। মহাভারতে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে যে কথা বলেছিলেন - এই কালে আমার স্নেহের ভাই সুহাসও তাই বল্‌ল। তার সম্মন্ধে ছোট্ট দুটো কথা বলিঃ- আমার বিবাহে আমি ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম সুহাস ও মঞ্জরী তো ছিলই। তারা আমায় মূল্যবান একটি বই উপহার দেয়। যা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন স্বাদের লেখায় সমৃদ্ধ। বইটির নাম-'বিচিত্রা'। তাতে লাল কালি দিয়ে লেখা আমার নাম ও তার তলায় লেখা - "লেনিন রায়"। লেখার মধ্য দিয়ে যা বইয়ের পাতায় চিরকাল ধরা রইল তা হল - "ত্বমেব সর্বং মমদেব দেব"। তাঁর দেহান্তের সংবাদ শুনে আমি আমার ভাইকে বলেছিলাম তোমার দ্বিতীয় বার পিতৃ বিয়োগ হল। সে উত্তরে আমায় শুধু বল্‌লে আমার "বাবা ও মা" দুই-ই একসঙ্গে চলে গেছেন। আমার ভাই বলে বলছি না, তার মতন শরণাগত, সমর্পিত প্রাণ বিশেষ দেখা যায় না।

সদ্ গুরু ত্বং নমামী।